প্রথম আলো

মতামত

বিশ্লেষণ

এসএসসি পরীক্ষার প্রয়োজন কতটুকু আছে?

এসএসসি পরীক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিল, এখন তা আর নেই; বরং এটি শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরীক্ষার কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাদের নতুন করে কেন চিন্তাভাবনা করা দরকার, তা নিয়ে লিখেছেন **মুনির হাসান**

মুনির হাসান
প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও যুব...

আপডেট: ০৩ আগস্ট ২০২৫, ১০: ৫৬

কয়েক দিন আগে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ছয় লাখের বেশি শিক্ষার্থী সেখানে অকৃতকার্য হয়েছে। একটি পাবলিক পরীক্ষায় ১৬ বছর বয়সী প্রতি তিনজনে একজন গড়ে ফেল করলে বা অকৃতকার্য হলেও এ ব্যাপারে আমাদের তেমন কোনো বিকার নেই।

কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, প্রতিবছর বাংলাদেশের গড়ে প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের প্রথম ধাপ হিসেবে একসময় এসএসসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিন্তু ২০২৫ সালে এসে এই পরীক্ষার কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার। কারণ, শুরুতে ও দীর্ঘদিন ধরে এসএসসি পরীক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিল,

এখন কিন্তু তা আর নেই; বরং এটি শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসএসসি শুধু একটি পরীক্ষা নয়; এটি শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত মানসিক চাপ, প্রাইভেট টিউটর বা কোচিংনির্ভরতা এবং মুখস্থনির্ভর পাঠ্যপদ্ধতির প্রতীক। এই প্রক্রিয়া আমাদের নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দিচ্ছে।

বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছি একটি পরীক্ষার পেছনে, যার ব্যবহারিক মূল্য এখন ক্ষীয়মাণ; যদি এর পরিবর্তে দক্ষতা, প্রকৃত শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নে বিনিয়োগ করা হতো, তাহলে হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারত।

ঔপনিবেশিক ভারত ও ‘কেরানি বানানোর শিক্ষা’

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন পোক্ত হতে শুরু করলে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসন চালানোর জন্য অনেক লোকের দরকার হয়। তখন সব লোককে ইংল্যান্ড থেকে আনাটা সহজ ছিল না। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষানীতিতে তাই একটা মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয় মেকলে মিনিটের (ম্যাকলে মিনিট অন এডুকেশন) আদলে।

থমাস ব্যাবিংটন মেকলে তাঁর এই প্রস্তাবে ইংরেজি জানা একটি শ্রেণি গড়ে তোলার কথা বলেন, যারা হবে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগকারী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের এই সাংস্কৃতিক কৌশলের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের জন্য ‘ভারতীয় চেহারার কিন্তু ব্রিটিশ চিন্তার’ জনবল তৈরি করাই ছিল মুখ্য।

এই নীতির ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয় এবং পরীক্ষানির্ভর কাঠামোর সূচনা ঘটে। বলাবাহুল্য, এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার

আবশ্যকতাও তৈরি হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গড়া মানেই সেখানে ভর্তির জন্য একটি ‘প্রবেশিকা’ বা যোগ্যতা ঠিক করা দরকার।

‘ম্যাট্রিকুলেশন’ শব্দটা এসেছে লাতিন ভাষা থেকে, যার মানে হলো কোনো তালিকায় নাম লেখানো। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মানে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ‘তালিকায় নাম লেখা’। এ জন্য প্রথমবারের মতো ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রবর্তন করা হয় ১৮৫৭ সালে। এরপর এটিই চালু হয়ে যায়।

কিন্তু পরে দেখা যায় যে ম্যাট্রিকুলেশনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে তাদের সরাসরি বিএ ক্লাসে পড়ানো কঠিন। কারণ, বিএ ক্লাসের সিলেবাস আর দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার মধ্যে একটা বড় ফাঁক রয়েছে। তখন একটি ‘মধ্যবর্তী’ বা ‘ইন্টারমিডিয়েট’ ব্যবস্থা চালু করার দরকার হয়।

কাজেই ভারতবর্ষে ফার্স্ট আর্টস (এফএ) বা ইন্টারমিডিয়েট এক্সামিনেশন ইন আর্টস চালু হয় ১৮৫৯ সালে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তিন স্তরবিশিষ্ট কাঠামো ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে: প্রথমে ম্যাট্রিকুলেশন, তারপর ইন্টারমিডিয়েট (এফএ) এবং পরিশেষে বিএ বা বিএসসি।

ম্যাট্রিক থেকে ইন্টারমিডিয়েট

শুধু ম্যাট্রিকুলেশন করে যেহেতু সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যাচ্ছে না, তখন ভারতবর্ষে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের কলেজ (যেখানে এফএ বা আইএ পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল) প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করে ১৮৭০-এর দশকে। যেমন রাজশাহী কলেজ ১৮৭৩ সালে জিলা স্কুল থেকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এফএ কোর্স চালু করে।

একইভাবে ভারতবর্ষে তখন অনেক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারা আরও জোরদার হয় ১৯১৭-১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশে। সেই সুপারিশে বলা হয়েছিল, 'ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়গুলোকে স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে পৃথক করে নেওয়া হোক আর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু প্রথম ডিগ্রি পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত হোক।'

এর ফলে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়কে 'কলেজ' হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণের ধারাবাহিকতা তৈরি হয়; যদিও বিশ্বজুড়ে ১২ ক্লাসের পর টারশিয়ারি (উচ্চতর) শিক্ষার প্রতিষ্ঠানই কলেজ নামে সমধিক পরিচিত।

বিশ্বজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ১২ বছরের স্কুলিং দরকার হয়। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলে এই পর্যন্ত যাদের যোগ্যতা, তাদের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়। ভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাসের সার্টিফিকেটের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

ব্রিটিশ আমলে এটি অব্যাহত থেকে পাকিস্তান পর্বে আসে এবং নাম বদলে এসএসসিতে (সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট) রূপান্তরিত হয়। একইভাবে এফএ বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষারও নাম বদলে এইচএসসি (হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট) করা হয় এবং বাংলাদেশ আমলেও তা অব্যাহত থাকে।

তবে বাংলাদেশ আমলে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিকার হয় এসএসসির শিক্ষার্থীরা। সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে উচ্চতর গণিত বাদ দেওয়া, পরে আবার এটিকে সংযোজন করা, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিকে আবশ্যিক করা ইত্যাদি নানা মারপ্যাঁচে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের ১৩০০ নম্বরের এসএসসি পরীক্ষা দিতে হয়! এ জন্য নবম ও দশম শ্রেণিজুড়ে অর্থাৎ দুই বছর ধরে এই বিষয়গুলো তাদের পড়তে হয়।

আমাদের পড়ালেখা এখনো মুখস্থনির্ভর পদ্ধতির, যদিও এর গালভরা নাম হলো ‘সৃজনশীল পদ্ধতি’। অনেকে এটাকে ‘সৃজনশীল মুখস্থ পদ্ধতি’ বলে থাকেন।

১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীর জন্য এ রকম একটি শিক্ষাব্যবস্থা নিঃসন্দেহে শারীরিক ও মানসিকভাবে অবর্ণনীয় চাপের। পরীক্ষার নাম করে তাদের খেলাধুলা, সৃজনশীলতা ও কৌতূহল সবই ক্রমাগত স্তিমিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে আর শিক্ষার্থী থাকে না, হয়ে পড়ে শুধুই পরীক্ষার্থী।

কার্যকারিতা কমে গেছে

অন্যদিকে দেশে শিক্ষার হারের বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি কাজে যোগ্যতার উন্নতির কারণে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এসএসসি উত্তীর্ণ মেয়েদের বেলায় সবচেয়ে বড় সুযোগ ছিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা। ১৯৯২ সালে এটি নির্ধারিত হয়।

কিন্তু ১৫ বছর পরে ২০০৭ সালে এই যোগ্যতাকে বাড়িয়ে এইচএসসি এবং সর্বশেষ ২০১৭-১৮ সালে এটিকে ডিগ্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শুধু এসএসসি উত্তীর্ণরা এখন আর সবচেয়ে বেশি পদের সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে না।

অন্যদিকে এসএসসি উত্তীর্ণদের একটিমাত্র লক্ষ্য—একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হওয়া!

বিশ্বজুড়ে ১২ বছরের শিক্ষাক্রম

বেশির ভাগ দেশেই (বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে) স্কুলিং ১২ বছর পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক ও সংহত কাঠামোয় পরিচালিত হয়। এর মাঝে কোনো বড় ধরনের পাবলিক

পরীক্ষা থাকে না; বরং ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়।

ফিনল্যান্ড, জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ায় পাবলিক পরীক্ষা থাকে শুধু স্কুল সমাপ্তির শেষে, ১২ ক্লাস শেষে, ১৮ বছর বয়সে। যুক্তরাষ্ট্রে ১২ বছর শেষেও কোনো পাবলিক পরীক্ষা থাকে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তারা স্যাটের (এসএটি) মতো পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে।

যুক্তরাজ্যে যদিও ও-লেভেল নামে একটি পরীক্ষা আছে, তবে সেটি একটি বিষয়ে দক্ষতা পরীক্ষা মাত্র। এমনকি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তির জন্য এর ফলকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য মূলত এ-লেভেল এর ফল বিবেচনা করা হয়।

ভারতে সিবিএসই এবং আইসিএসই বোর্ডে দশম শ্রেণির পরীক্ষা থাকলেও সেটি অনেকটাই নিয়মতান্ত্রিক এবং উচ্চশিক্ষা বা চাকরির জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতেও এখন বহু রাজ্যে একক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোনো স্তরে বড় পাবলিক পরীক্ষা নেই।

ভারতের নতুন শিক্ষানীতি (এনইপি ২০২০) মাধ্যমিক শিক্ষায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা বছরে একাধিকবার নেওয়া যাবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ স্কোরটি রাখতে পারে।

পরীক্ষার চাপ কমাতে গুরুত্ব পাচ্ছে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও স্কুলভিত্তিক পরীক্ষা। চালু হয়েছে ‘ক্রেডিট ব্যাংক’-এর ধারণা, যেখানে শিক্ষার্থীরা সময়ভেদে অর্জিত সাফল্য সংরক্ষণ করতে পারবে। ফলে ভারতও মুখস্থনির্ভরতা থেকে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার দিকে যাচ্ছে।

বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছি একটি পরীক্ষার পেছনে, যার ব্যবহারিক মূল্য এখন ক্ষীয়মাণ *ফাইল ছবি*

খরচ হাজার কোটি টাকার বেশি

ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোতে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারক এসএসসি পরীক্ষার পেছনে জাতির খরচ কত, সেটি হিসাব করা যাক। *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন শিক্ষার্থী ও তার পরিবার এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি, কোচিং, বইপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বাবদ গড়ে প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয় করে। এই হিসাবে ২০ লাখ শিক্ষার্থীর মোট ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। (*দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ৩০ মার্চ ২০২৪)

এসব খরচের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সরকারি ফি দেওয়া, সরকারি ফি-বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা, পরীক্ষা চলাকালে প্রতিটি পরিবারের আলাদা টাকা খরচ হিসাব করলে সব

মিলিয়ে খরচ নেহাত কম হয় না। আর এত টাকা, শ্রম ও পরিশ্রমের ফলে শিক্ষার্থী কেবল একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে।

বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছি একটি পরীক্ষার পেছনে, যার ব্যবহারিক মূল্য এখন ক্ষীয়মাণ; যদি এর পরিবর্তে দক্ষতা, প্রকৃত শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নে বিনিয়োগ করা হতো, তাহলে হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারত।

ধাপে ধাপে এসএসসি বাতিল ও রূপান্তর

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা হবে ১২ বছরের একটানা ধারায়: প্রাথমিক (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি) ও মাধ্যমিক (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)। এই কাঠামোয় দশম শ্রেণির এসএসসি পরীক্ষা আসলে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধক।

এখন সময় এসেছে এটাকে ধীরে ধীরে বাদ দিয়ে একটি আধুনিক, মূল্যায়নভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরের। শুরুতে শিক্ষা খাত সংস্কারের অংশ হিসেবে ১২ বছরের ধারাবাহিক শিক্ষার দিকে যাওয়ার কথা স্পষ্টভাবে গ্রহণ করা দরকার। এরপর নির্দিষ্ট কিছু জেলায় পাইলট প্রকল্প চালু করে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন শুরু করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে ধারাবাহিক ও বিকল্প মূল্যায়নের বিষয়ে। আমার ধারণা, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন করা অসম্ভব হবে না।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১২ বছরের শিক্ষাজীবন শেষে শিক্ষার্থীরা একটি মাত্র পাবলিক পরীক্ষায় (এইচএসসি) অবতীর্ণ হবে এবং এর সনদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা লাভ করবে।

এসএসসি শুধু একটি পরীক্ষা নয়; এটি শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত মানসিক চাপ, প্রাইভেট টিউটর বা কোচিংনির্ভরতা এবং মুখস্থনির্ভর পাঠ্যপদ্ধতির প্রতীক। এই প্রক্রিয়া

আমাদের নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দিচ্ছে।

সময় এসেছে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার। এসএসসি পরীক্ষাকে ইতিহাসে পাঠিয়ে আমরা একটি মানবিক, দক্ষ ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে পারি। একটি আধুনিক শিক্ষাবান্ধব বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বার্থেই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এসএসসি পরীক্ষা বাতিল করা হোক।

● **মুনির হাসান** *প্রথম আলোর* ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের প্রধান সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক

**মতামত লেখকের নিজস্ব*

prothomalo.com

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো |

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান